সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

কুরআন সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সত্যকে দেখায়, কিন্তু একমাত্র সে-ই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে যার চোখ আছে। অন্যরা চোখ থাকতেও অন্ধ।

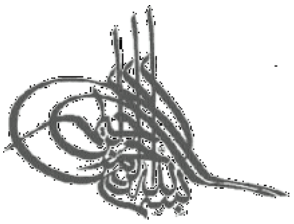

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

ফাল্গুন ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রবিউস সানি

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

ইলিশের সাগর-যাত্রা এবং জীবনের উৎসমুখ

আমীন : আমার প্রতিবেশী একজন ভাবুক মানুষ। আত্মভোলা বলতে পারেন। কবিতা লেখেন। গত রাতে শুনতে পেলাম ওর স্ত্রী ওকে খুব তিরস্কার করছেন– 'অমুকের মতো পয়সা উপার্জন করতে পারো না, তোমার কবিতা ধুয়ে কি পানি খাবো' ইত্যাদি। মহিলার কণ্ঠে ঝাঁজ। ভদ্রলোক চুপ করে ছিলেন।

গুরু : মহিলার কোনো দোষ নেই। হয়তো সংসারের অভাব সইতে না পেরেই এ রকম করেছেন। মুশকিল হলো, ভদ্রলোকের যা নেই সেটার খোঁজ সঙ্গত কারণেই তার স্ত্রী রাখেন কিন্তু যা আছে তার খোঁজ তিনি রাখেন না।

আমীন : আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না হুজুর।

গুরু : দেখো, ভদ্রলোক কবি মানুষ। তার অন্তরের প্রসারণ আছে, অন্তর বিকশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষের হৃদয়ের এ ব্যাপ্তি এক অমূল্য সম্পদ। ভদ্রলোকের সে সম্পদ আছে। কিন্তু সে তো কড়ির দামে কেনা যায় না। তাই স্ত্রীর কাছে তিনি একটা অপদার্থ। যা হোক, ভদ্রলোককে একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতে পারো কি না দেখো না।

আমীন : চাকরি যেটা করেন সেটা খারাপ না। কিন্তু উনি তো হারাম খান না। যদিও ইচ্ছে করলে অনেক পয়সাই বাগিয়ে নিতে পারেন। ওর স্ত্রীর রাগটা ওখানেই। ভাবলে সত্যি অবাক লাগে, এ বিচিত্র সংসারে কত বিচিত্র মানুষই না আছে। আচ্ছা, আমরা তো সবাই যে যার মতো চলছি, কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী?

গুরু : মানুষ নিজেই নিজের একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে নেয়। কেউ রাজা হতে চায়, কেউ উজির হতে চায়, কেউ প্রভূত ধনসম্পত্তি চায়। মানুষের জীবন একটা বহমান স্রোতস্বিনীর মতো– মানুষ যাতে ভেসে চলেছে। তাই তার চলাটাই একমাত্র সত্য তাঁর কাছে। কিন্তু এ চলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত সে কথা ভাবার সময় তার নেই। সে একবারও ভাবে না এ জীবন আল্লাহর দেওয়া এক তুলনাহীন নেয়ামত। এ জীবন মানুষকে দেওয়া এক আমানত। কিন্তু মানুষ এ আমানতের খেয়ানত করে। তার দেহটার মধ্যে একদিকে আছে পশুর সমস্ত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে তার আত্মায় আছে আল্লাহর যাতের অপার মহিমা। দুয়ের মধ্যে একটা নিরন্তর সংঘাত চলছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা তাকে প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে দেয়। তখন আত্মার কথা সে বিস্মৃত হয়। এ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসই তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে কি আর মানুষ থাকে? মনুষ্যদেহরূপী একটা পশু তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এ মানুষই যখন জীবনের প্রবাহ থেকে ক্ষণিকের জন্য সরে দাঁড়ায়– তাকিয়ে দেখে মহান স্রষ্টার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের দিকে, তখন তার মাথা নুয়ে আসে। চোখ ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে কিন্তু কোথাও কোনো ত্রুটি সে খুঁজে পায় না। সে তখন নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নয়– এ জীবন যাঁর দান তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায়। পার্থিব জীবনের বাইরে একটা নতুন জীবনের সন্ধান সে পায়। আর সে দিকেই সে ধাবিত হয়। নবজীবন লাভ করে এ মানুষটি তখন স্রষ্টার স্মরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে আর মহান আল্লাহর সৃষ্টির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাঁর প্রশংসা করে। এদের সম্পর্কেই সুরা এমরানের ১৯০ এবং ১৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– ইন্না ফি খলক্বিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ ওয়াখ তিলাফিল লাইলে ওয়ান্নাহার লা আয়াতিল্লি উলিল আলবাব আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা ক্বেয়ামাওয়াকু'য়ুদাও ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা ফি খলক্বিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতিলা সুবহানাকা ফাক্বিনা আজাবান নার– অর্থাৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনে নির্দেশনাবলি রয়েছে– যারা বসে, দাঁড়িয়ে কিংবা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে– হে আমার প্রতিপালক তুমি এ বিশ্ব নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো। এখানে লক্ষ করলে দেখবে, আল্লাহ দুটি জিনিসকে মানুষের অর্থাৎ সত্যিকার মানুষের করণীয় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন– একটি হচ্ছে জিকির বা স্মরণ আর একটি হচ্ছে মোরাকাবা বা ধ্যান। জিকির নানা ধরনের হয়– এর মধ্যে একটি হচ্ছে পাস-আনফাস অর্থাৎ প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁকে স্মরণ করা। আর যেহেতু এ স্মরণ মানুষ প্রতি পলে করে সে জন্য খোদার ধ্যানও এর সঙ্গেই থাকে। সে জন্য পাস-আনফাস একদিকে যেমন জিকির, অন্যদিকে মোরাকাবাও বটে। এ জন্য একে মোরাকাবায়ে সিদ্দিক বলে।

আমীন : হুজুর, মোরাকাবার একটি উদ্দেশ্য তো নিজেকে বুঝবার চেষ্টা করা এবং একই সঙ্গে সৃষ্টির রহস্যকে ধ্যান করা।

গুরু : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। এ সম্পর্কে হুজুর পাকের (সা.) একটা হাদিস আছে। হুজুর পাক (সা.) বলেছেন, আল্লাহ হিসাব নেওয়ার আগেই নিজে নিজের হিসাব নিয়ে নাও। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন– হুজুর বলে দিন হিসাব কী করে নিতে হয়। রাসুল (সা.) জবাবে বলেছিলেন, এ হিসাব ছয় রকমে নেওয়া যায়– এগুলো হচ্ছে মোশারতাহ, মোরাকাবাহ, মোহাসাবাহ, মোয়াকাবাহ, মোজাহেদা এবং মোয়াতাবাহ। মোশারতাহ হচ্ছে কৌশলের সঙ্গে নিজের ছটি নফসকে নিজের গোলাম করে নেয়া। মোরাকাবাহ হচ্ছে নির্জনে বসে আল্লাহকে ধ্যান করা। মোয়াকাবাহ হচ্ছে নিজের ইচ্ছার খেলাপ করা অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। মোজাহেদা হচ্ছে নফসের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করা। আর মোয়াতাবাহ হচ্ছে নিজের নফসকে তামবিহ করা বা তিরস্কার করা। লক্ষ করে দেখো, সবগুলোরই পদ্ধতি হচ্ছে ধ্যান আর সবগুলোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনা। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে আসলেই মোহমুক্তি ঘটবে আর তখনই স্রষ্টা এসে বান্দার ক্বালবে তাঁর স্থান করে নেবেন। যে অন্তরে মোহ আছে সে অন্তর তো স্রষ্টার আরশ নয়। বলা হয়েছে– কুলুবুল মুমেনিনা আরশে আল্লাহ– অর্থাৎ মুমিনের ক্বালব হচ্ছে আল্লাহর আরশ। মনে রেখো, ছটি নফস কোনোটিই তোমার সত্যিকারের বন্ধু নয়। নফসে মুতমায়িন্না যতই ভালো হোক না তাকেও ছেড়ে আসতে বলা হয়েছে আল্লাহর মারেফতের জন্য। এরশাদ হচ্ছে– ইয়া আইয়াতুহান্নফসুল মুতমায়িন্নাহ ইরজেই ইলা রাব্বিকে রাদিয়াতাম মার্দিয়াহ ফাদখুলি ফি এবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। এখানে নফসে মুতমায়িন্নাকে স্রষ্টার কাছে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে– বলা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য। তবেই তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হবে। মনে রেখো, এ জান্নাত হচ্ছে স্রষ্টার দিদার তাঁর মারেফাত, তাঁর দর্শন। ভালোমন্দ সব রকম নফসের ফাঁদ থেকেই চাই মুক্তি– আর সে মুক্তিই দেবে আল্লাহর গোলামির সনদ যার পরিবর্তে সে পাবে স্বয়ং স্রষ্টাকে। জীবনের উদ্দেশের কথা জানতে চাইছিলে। জীবন এসেছে যাঁর কাছ থেকে জীবন আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। যে নিরন্তর সাধনা করে মানুষ হতে পারে সেই পারে ফিরে যেতে উৎসমুখে। এ যেন ভরা বর্ষায় ইলিশের ঝাঁকের মতো। ইলিশ উজানে আসে ডিম পাড়তে– ঝাঁকে ঝাঁকে আসে কিন্তু সবাই কি পারে সমুদ্রে ফিরে যেতে? শিকারি জেলে জাল নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। জালে মারা পড়ে বহু ইলিশ– একইভাবে নফস নামক শিকারির হাতেও মারা পড়ে হাজারো মানুষ। সমুদ্রের গভীরে ফিরে যেতে পারে ক'টি ইলিশ? ঠিক তেমনি ক'জন মানুষ পারে মানবসত্তার মোহ কাটিয়ে আল্লাহর পথে বিলীন হতে? ■

সুফি দর্শনের প্রাক-কথা

আলম শামস

সুফিবাদ বা সুফি দর্শন একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা বা কলব সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এ দর্শনের মূলকথা। মহান আল্লাহকে জানার ও তাঁর দিদার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে সুফি দর্শন বা সুফিবাদ বলা হয়। হযরত ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর মতে, মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হয়োর নামই সুফিবাদ। সুঠ অর্থ পশম আর তাসাউফের অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতঃপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাউফ। ডিনি নিজেকে এইরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন। শরিয়তের পরিভাষায় সুফিবাদকে তাসাউফ বলা হয়। ডার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। তাসাউফ বা সুফিবাদ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশদ্ধির সাধনাকে বোঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ এবং ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ লাভ করা যায়। তাসাউফ দর্শন অনুযায়ী এ সাধনাকে তরিকত বা আল্লাহপ্রাপ্তির পথ বলা হয়। তরিকত সাধনায় মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। সেই পথ হলো ফানা ফিশ শায়েখ, ফানা ফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হওয়ার পর বাকাবিল্লাহ লাভ হয়। বাকাবিল্লাহ অর্জিত হলে সুফি দর্শন অনুযায়ী সুফি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং সুফি দর্শনের প্রবর্তক। তিনি বলেন, মানবদেহে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে, যা সুস্থ থাকলে পুরো দেহ পরিশুদ্ধ থাকে, আর তা অসুস্থ থাকলে পুরো দেহ অপরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জেনে রেখো এটি হলো কলব, আত্মা বা হৃদয়। আল্লাহর জিকির বা স্মরণে কলব কলুষমুক্ত হয়। সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর প্রেমার্জন সুফিবাদের উদ্দেশ্য। যারা তাঁর প্রেমার্জন করেছেন, তাদের তরিকা বা পথ অনুসরণ করে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ অর্জন করাই হলো সুফি দর্শন।

সুফিবাদ উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সুফি-দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকরা নানা শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করে এ দর্শনকে সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। কালক্রমে বিখ্যাত ওলি-আল্লাহদের মাধ্যমে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে:

গাওসুল আজম বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা; সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা; গাওসুল আজম হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারি প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া মাইজভাণ্ডারিয়া তরিকা, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরিকা এবং হযরত শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানি সারহিন্দি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দেদিয়া তরিকা। এ ছাড়াও সুহরাওয়ার্দিয়া, মাদারিয়া, আহমদিয়া, কলন্দরিয়া নামে আরও কয়েকটি তরিকার উদ্ভব ঘটে।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানরা সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে প্রকাশ করার জন্য তাসাউফ শব্দটি ব্যবহার করতেন। ঐতিহাসিক সুফিদের মতে, তাসাউফ ইসলামের একটি বিশেষ রূপ, যা ইসলামিক শরিয়া আইনের অনুরূপ। তাদের মতে, বিশ্বের সব ধরনের মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরিয়া এ বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তারা মনে করেন, তাসাউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য এবং ইসলামিক বিশ্বাস এবং অনুশীলনের অপরিহার্য অংশ। কার্ল এর্নস্টের মতে, সুফিবাদ শব্দটি কোনো ইসলামিক গ্রন্থ বা কোনো সুফিদের কাছ থেকে আসেনি। তার মতে শব্দটি এসেছে প্রাচ্যের ভাষাবিষয়ক ব্রিটিশ গবেষকদের কাছ থেকে। ইসলামিক সভ্যতায় তারা যে মনোমুগ্ধকর বিষয় উপলব্ধি করেন এবং তৎকালীন যুক্তরাজ্যে ইসলাম সম্বন্ধে যে নেতিবাচক ধারণা বা বিশ্বাস বিরাজ করছিল তার মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করতে তারা সুফিবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন।

বাংলায় সুফিবাদের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশে ইসলামের সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার হয়েছে বলে জানা যায়। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সুফিরা এসে বঙ্গদেশে সুফিবাদ প্রচার করেন। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যেসব সুফি-সাধক এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন– তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: শাহ সুলতান রুমি (রহ.), বাবা আদম শহীদ (রহ.). শাহ সুলতান বলখি (রহ.), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশেকন (রহ.), শাহ মখদুম রূপোষ (রহ.), শেখ ফরিদউদ্দিন শক্করগঞ্জ (রহ.), মখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রহ.) প্রমুখ। এরা ধ্যান-সাধনায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেও কথিত আছে। তাদের অসাধারণ জ্ঞান, বাগ্মিতা ও মানবপ্রেমের কারণে এদেশের সাধারণ মানুষ সুফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এভাবে ক্রমেই বঙ্গদেশে সুফিবাদ প্রসার লাভ করে। ১২০৪ থেকে ১২০৫ খ্রস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলাদেশ বিজিত হলে ইসলামের শরিয়ত ও মারেফত উভয় ধারার প্রচার ও প্রসার তীব্রতর হয়। শাসক শ্রেণির সঙ্গে অনেক পীর-দরবেশ এদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। মুসলিম বিজয়-উত্তর যে ক'জন সুফি-দরবেশ ইসলাম ও সুফিবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাদের মধ্যে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজি (রহ.), হযরত শাহজালাল (রহ.), শেখ আলাউল হক (রহ.), খাজা খানজাহান আলী (রহ.), শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.), শাহ ফরিদউদ্দিন (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা সুফিবাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চমৎকারভাবে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন। ফলে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মতবাদ প্রসার লাভ করে। সুফি সাধকদের আগমনের আগে বঙ্গদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের লোক বসবাস করতেন। এ দুই ধর্মের গুরু-সাধকরা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে দীক্ষা দান করতেন। সুফিরা ইসলামের মহাসত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন প্রেমের মাধ্যমে। মানবপ্রেম তথা সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেমার্জন সুফিবাদের মূল আদর্শ। সুফিরা নিজেদের আদর্শ জীবন এবং সুফিবাদের প্রেম-ভ্রাতৃত্ব-সাম্যের মধুর বাণী প্রচার করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত হয়েছেন। অনেকের মাজার-মাকবেরা আছে, যেগুলোর প্রতি আজও সব শ্রেণির মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পবিত্র ও পুণ্যস্থান বিবেচনায় সাধারণ মানুষ দোয়া-দরুদ পাঠসহ নিয়মিত জেয়ারত করে ও কামনা-বাসনায় মানত করে।

সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেমার্জন সুফিবাদের এ আদর্শের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম, লৌকিক মরমীবাদ, বাউল ধর্মমত ও অন্যান্য ভক্তিবাদ কমবেশি প্রভাবিত হয়। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনেও সুফিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াতের সময় মাঝিরা বদর পীরের নাম স্মরণ করে। শুধু তাই নয়, নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর উদ্দেশে শহরের যানবাহনে পর্যন্ত বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার নাম লেখা থাকে। লৌকিক ধারার মুর্শিদি-মারফতি, মাইজভাণ্ডারি ও গাজীর গান, গাজীকালু-চম্পাবতী কাব্য ও অন্যান্য মরমী সাহিত্য, মাদার পীর ও সোনা পীরের মাগনের গান ইত্যাদি বিভিন্ন পীর-দরবেশকে কেন্দ্র করে রচিত। এভাবেই বাংলায় মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুফিবাদের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। ■

ধোঁকাবাজি থেকে হিফাজত হওয়া
- রূহের পবিত্রতা যা হলো চোখের এক পলকের জন্য হলেও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না থাকা
যাকে স্রষ্টার হক এবং সৃষ্টের হক যথাযথভাবে বজায় রাখতে পারার তওফিক দেওয়া হয়েছে সে আল্লাহর হিফাজতে আছে। হিম্মা হলো অন্তরকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে নিজের পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জনে জারি রাখা এবং অন্যদের একই লক্ষ্যে সাহায্য করা। আল্লাহর পরিচয়ে সৌভাগ্যবান তারাই যারা সবকিছুর যে নির্যাস সে সম্পর্কে সচেতন।
হিম্মত (aspiration) বা আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে অর্জন করার প্রতি আকাঙ্খিত হয় তার তিনটি ধাপ রয়েছে: তানবিহ বা সচেতন হওয়া, ইরাদা বা ইচ্ছা করা এবং আল-হিম্মাহ হাকিকিয়া বা সত্যিকারের হিম্মত।
তানবিহ বা সচেতনা হওয়া বলতে বুঝায় ঐ ব্যক্তির প্রকৃত বাস্তবতানুসারে তার যে আকাঙ্খা বা ইচ্ছা সেটি সম্ভব অথবা অসম্ভব সেটা সম্পর্কে অন্তরের সচেতন হওয়া। অন্তরকে নিরাসক্ত অবস্থায় দেখতে সক্ষম হতে হবে যেন সে তার আকাঙ্খাকে বিচার করতে পারে। যদি জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা তাকে পিছু হটতে নির্দেশ দেয় তবে তার সেই আকাঙ্খাকে প্রতিরোধ করা উচিত। অন্যথায় যদি জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বিচার আকাঙ্খার পক্ষ নেয় তবে তানবিহ তাকে অনুসরণ করার হিম্মাহ প্রদান করে। সুতরাং হিম্মতওয়ালা ব্যক্তির নিজের আকাঙ্খা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত।
অন্যদিকে আকাঙ্খার হিম্মত হলো খোদা অন্বেষী ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতার প্রথম চিহ্ন। এই ধরনের হিম্মত ক্রমবর্ধমান এবং কোনো কিছুই এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। এই ধরনের আধ্যাত্মিক হিম্মত যখন একজন ব্যক্তির ভেতরে জন্ম নেয় তখন এটি মহাবিশ্বকে প্রভাবিত করার শক্তি রাখে। আকাঙ্ক্ষা খুব দৃঢ় হলে এটি এমন ব্যক্তির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে যার কাছে কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আসে না অথবা যার বিশ্বাসও ততটা প্রবল নয়।
এই পৃথিবীতে কোনো কোনো ব্যক্তির হাতে যে সকল আলামত/চিহ্ন প্রকাশিত হয় তার মূল কারণ হলো হিম্মত। এই হিম্মতের আছে এক ধরনের শক্তি। যখন খোদা অন্বেষী ব্যক্তির মধ্যে হিম্মত জন্ম নেয় তখন তা একজন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গুরুকেও প্রভাবিত করতে পারে এবং গুরু তখন তা পরিচালনা করার শক্তিও পেয়ে যান। কখনো কখনো গুরুর ভেতরে বিশেষ জ্ঞানের দরজা খুলে যায় যা গুরুর জন্য যতটা না প্রয়োজন বা প্রযোজ্য তারচেয়ে বেশি প্রযোজ্য হিম্মতওয়ালা মুরিদের জন্য। খোদা অন্বেষী মুরিদের কারণে এই জ্ঞান সহসাই গুরুর কাছে চলে আসতে পারে। এর মাধ্যমে গুরু মুরিদকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে, কেননা মুরিদ তার গুরু ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। মুরিদ ও গুরুর যৌথ আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে খোদা অন্বেষী মুরিদের লক্ষ্য অর্জিত হয়।
সত্যিকারের হিম্মত ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার ফল। আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির মধ্যে মহান গুরুদের এই হিম্মত থাকে যারা তাদের হিম্মতসমূহের মিলন ঘটান যার মাধ্যমে আহাদিয়াতের জন্য যা হক তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গুরুরা যা বহু তাকে বর্জন করেন এবং তাওহিদকেই কামনা করেন। তারা বহুত্বকে আসমা বা নামের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। এই মহান গুরুরা বিভিন্ন মাকামের হলেও তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। আল্লাহ তাদেরকে তাদের মাকাম অনুসারে বিবেচনা করে থাকেন এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেন না। এর কারণ হলো প্রতিটি মাকাম একটি নির্দিষ্ট দিকে হকের দিকে মুখাপেক্ষী।

তাকওয়া

সাধারণ মানুষের জন্য তাকওয়া হলো যেকোনো পাপ চিন্তা এবং পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা। অন্যদিকে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য তাকওয়া অর্থ অন্তরকে একমাত্র আল-হক ব্যতীত যাবতীয় অন্য বস্তু থেকে চিন্তামুক্ত রাখা। জেনে রাখা প্রয়োজন যে তাকওয়া বান্দাকে অর্জন করতে হয় এবং যে কারণে এটি অর্জনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সকল নির্দেশনার জন্য এটা প্রযোজ্য যে যখন কেউ সেই নির্দেশনা বরাবর কাজ করে তখন সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বান্দা সে মাকামের অধিকারী হয়।
তাকওয়াকে দুভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি হলো আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য, তাঁক সেভাবে সমীহ করা যেরকম সমীহ তাঁর প্রাপ্য এবং যাবতীয় মন্দ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। দ্বিতীয় ভাগটি হলো তিনি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তার যতটুকু আমাদের সাধ্য ততটুকু করার।

অনুবাদ: সাদিক মোহাম্মদ আলম
(চলবে)

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) - এর সুফিতত্ত্ববোধিনী কথামৃত সাগর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এই গ্রন্থটি সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) কর্তৃক মারকাজে প্রদত্ত মূল্যবান উপদেশমালা থেকে গ্রন্থিত। এই বইটি সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) স্মারক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয়।
পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা: প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।
ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬
আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

আত্মার গহিনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

** শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (জন্ম ১৯৩৫ - ওফাত ২০১৫) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং বর্তমানে সাজিলিয়া সুফি তরিকার মুর্শিদ। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী। তার মাকাম জেরুজালেমে অবস্থিত। **

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

আহাদিয়াত

সুরা ইখলাসের "কুল হু আল্লাহু আহাদ" / "বলে দিন, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়" - এই আহাদিয়াতের প্রকাশ কোনো নাম বা সিফাত বা প্রভাব নয়, বরং এটি সরাসরি যাতের তাজাল্লি যা এক অদ্বিতীয় ও অখণ্ড পরম সত্তার প্রতিভাস (manifestation)।

আপনাকে হারিয়ে ফেলে, নিজের প্রতি আরোপিত সকল গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিস্মরিত হলে ঠিক সেই মুহূর্তে পুরো মহাবিশ্বে আপনার একান্ত সত্তায় আপনিই আহাদিয়াতের প্রতিভাস, অন্য কোনো কিছুতে নয়।

জাতের প্রথম যে প্রতিভাস তা হলো এই আহাদিয়াত। সৃষ্ট জগতে কোনো কিছুকে আহাদিয়াতের সাথে সংলগ্ন করা নিষিদ্ধ কেননা উবুদিয়া বা বান্দার শর্ত হলো অঙ্গীকার পূরণ করা, সীমাকে সম্মান করা, যা উপস্থিত তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং যা হারিয়ে যায় তাতে ধৈর্য ধারণ করা। উবুদিয়া বা বান্দাত্ব হলো সকল মুহূর্তের জন্য আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকা, ঠিক যেভাবে তিনি সকল সময়ের জন্য আপনার প্রভু। উবুদিয়া হলো নিজের পক্ষে যেকোনো ধরনের ক্ষমতা, কর্তৃত্বের দাবি ইত্যাদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং যা কিছু সম্পদ ও বরকত তিনি দান করেছেন তা গ্রহণ করা।

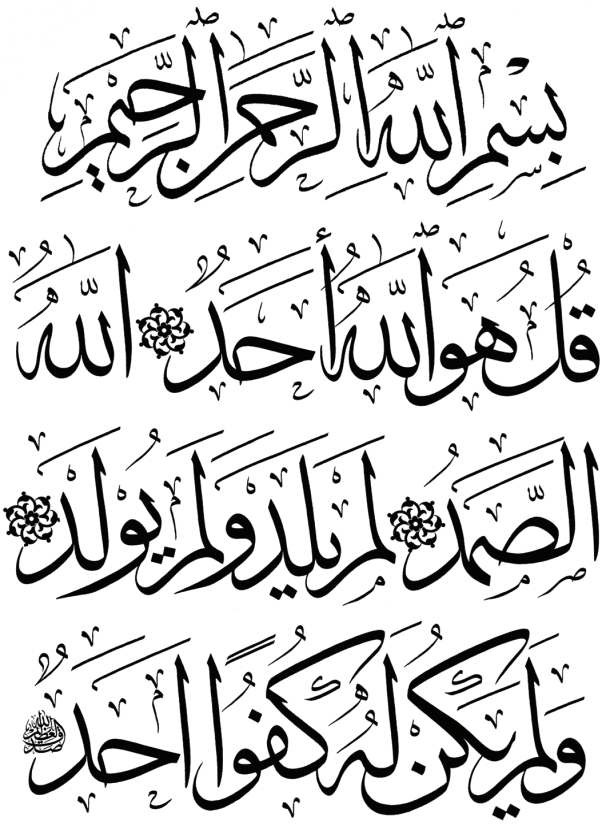

সুতরাং বান্দার বৈশিষ্ট্য হলো সে সর্বদা নিজেকে তার প্রভুর সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে এটা আল্লাহর ঘোষণা যে তাঁর পবিত্র এবং পছন্দ করা বান্দারা তাদের গলায় দাসত্বের শৃঙ্খল না নিয়ে এই দুনিয়া ত্যাগ করবে না। যে কেউ নিজেকে গায়রুল্লাহ নিয়ে ব্যস্ত রাখবে সে তার জীবন এবং শান্তি দুটোই হারাবে। কেউ যদি শান্তি কামনা করে তবে তাকে অন্য কিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহকেই বেছে নেওয়া উচিত। আল্লাহর সাথে সংযুক্ত দাসত্ব অর্থ 'তিনি ছাড়া আর কারো শক্তি ও ক্ষমতা নেই' এই উপলব্ধি অর্জন করা এবং আল্লাহই রিজিকদাতা এটা স্বীকার করে তাকে মান্য করার হক্ক আদায় করা। জেনে রাখা প্রয়োজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো ইবাদত, খাস বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো উবুদিয়াত, খাস বান্দাদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে খাস তাদের বৈশিষ্ট্য হলো উবুদা বা পরিপূর্ণ দাসত্ব।

আল্লাহকে অমান্য করা থেকে বান্দাকে হেফাজত করার নামই পবিত্রতা দান করা (আত-তাহির)। এই পবিত্রতা বিভিন্ন রকম হতে পারে:

- বাহ্যিক পবিত্রতা যা হলো আল্লাহকে অমান্য করা থেকে হিফাজত পাওয়া
- অন্তরের পবিত্রতা যা হলো গোপন ওয়াসওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।